কবি মহাদেব সাহার পঞ্চাশ বছর পূর্তি

মহাদেব সাহা

জন্ম ৫ আগস্ট, ১৯৪৪। ধানঘড়া, সিরাজগঞ্জ।
পিতা গদাধর সাহা, মাতা বিরাজমোহিনী দেবী।
ঢাকা কলেজ, বগুড়া কলেজ ও
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।
ষাট-দশকের মাঝামাঝি থেকে
প্রায় তিরিশ বছর কাব্যসাধনায় নিয়োজিত।
স্ত্রী নীলা সাহা, দুইপুত্র তীর্থ সাহা ও সৌধ সাহা।

কাব্যগ্রন্থ
এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২)
মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩)
চাই বিষ অমরতা (১৯৭৫)
কী সুন্দর অন্ধ (১৯৭৮)
তোমার পায়ের শব্দ (১৯৮২)
ধুলোমাটির মানুষ (১৯৮২)
ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৪)
লাজুক লিরিক (১৯৮৪)
আমি ছিন্নভিন্ন (১৯৮৬)
মানুষ বড়ো ক্রন্দন জানে না (১৯৮৯)
নির্বাচিত কবিতা (১৯৮৯)
প্রথম পয়ার (১৯৯০)
কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ (১৯৯০)
প্রেমের কবিতা (১৯৯১)
রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯১)
অস্তমিত কালের গৌরব (১৯৯২)
আমূল বদলে দাও আমার জীবন (১৯৯৩)
একা হয়ে যাও (১৯৯৩)
যদুবংশ ধ্বংসের আগে (১৯৯৪)
কোথায় যাই, কার কাছে যাই (১৯৯৪)।

প্রবন্ধগ্রন্থ
আনন্দের মৃত্যু নেই (১৯৮৪)
মহাদেব সাহার কলাম (১৯৯২)

কবির পঞ্চাশ বছর উদযাপন
বিকেল ৫টা, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪
বকুলতলা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
আহ্বায়ক : হুমায়ুন আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নুরুল হুদা

ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি মহাদেব সাহার পাঠকপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন কবি উৎকৃষ্ট হ'লেই জনপ্রিয় হন না এবং লোকপ্রিয় হলেই তাৎপর্যপূর্ণ হন না। সচরাচর এরকমই লক্ষ করা যায়। যুগপৎ উৎকর্ষ এবং জনপ্রিয়তা খুব কম কবির বেলায় ঘটে। সদ্য পঞ্চাশ-পেরুনো মহাদেব সাহা সেই বিরলদের একজন। বাংলাদেশের কাব্যক্ষেত্রে এখন তাঁর যে স্থান তা' সহজে অর্জিত হয় নি। শ্রম ও নিষ্ঠা তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

মহাদেব সাহার কবিতা পড়লে একজন অমনোযোগী পাঠকও বুঝতে পারবেন যে, এই কবি স্বদেশপ্রেমে যেমন আপ্লুত তেমনি উদ্দীপ্ত মানবিকতাবোধে। প্রগতিশীল চিন্তাধারা তাঁকে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রেখেছে। সমাজের বিরূপতা, কখনো-কখনো নিষ্ঠুরতা লক্ষ ক'রে কবি বিচলিত ও বেদনার্ত হন বটে, কিন্তু কোনোরকম মালিন্য কব্জা করতে পারে না তাঁকে। তিনি জানেন, যন্ত্রণাই জীবন। তিনি নিজে কষ্ট পান, বেদনাদগ্ধ হন, তবে আমরা মহাদেব সাহার কাছ থেকে পেয়ে যাই কিছু মর্মস্পর্শী কবিতা।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নানামুখী সঙ্কট মহাদেব সাহাকে উদ্বিগ্ন করে, উত্তেজিত করে। ফলে কখনো কখনো তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে বেজে ওঠে, অথচ তিনি নিম্নকণ্ঠ অভিমানী এক কবি, যার পরিচয় আমরা পাই তাঁর প্রেমের কবিতায়। মহাদেবের কবিতায় যারা অভিনবত্ব খুঁজতে যাবেন তাদের নিরাশ হ'তে হবে। তাঁর কবিতা কখনো চমকপ্রদ নয়। তিনি আবেগ ও মেধা দিয়ে এমন এক আবহ নির্মাণ করেন কবিতায়, যার আবেদন অনস্বীকার্য। পাঠক সেই পরিমণ্ডলে স্বস্তি বোধ করেন, এক ধরনের আশ্রয় লাভ করেন।

কবিতা রচনায় মহাদেব সাহার ক্লান্তি নেই। প্রায়শই তাঁর কবিতাগুচ্ছ পড়ার সুযোগ পাই বিভিন্ন পত্রিকায়। তিনি, আশা করি, দীর্ঘকাল কাব্যরসপিপাসুদের আনন্দিত, মুগ্ধ করবেন। ভাবতে অবাক লাগে, এই সেদিনের তরুণ মহাদেবও পঞ্চাশের কোঠায় পা রাখলেন তাঁর বন্ধু এবং শক্তিশালী কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের যে কবিগণ অর্ধ শতাব্দী যাপন করলেন তাঁরা সবাই শতায়ু হোন, এ আমার আন্তরিক কামনা।

মহাদেব সাহার কল্যাণ হোক, পুষ্পবিকাশের সুরে অধিকতর গুঞ্জরিত হোক তাঁর কবিজীবন।

শামসুর রাহমান
১৫.১১.৯৪

বন্ধু মহাদেব অর্ধশতাব্দী হয়ে গেলেন,
এটা বিস্ময়ের মতো লাগছে আমার;
দেখতে দেখতে আমরা, যারা এই কয়েকদিন আগে
কিশোর ছিলাম, চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হয়ে যাচ্ছি,
একদিন শতাব্দী হয়ে যাবো,
মহাকাল হয়ে যাবো।
আমার বেঁচে থাকা কয়েক দশক ধ'রে
যে-সব কারণে সুখের ব'লে মনে হয়েছে,
তাঁর মধ্যে মহাদেব আছেন,
তাঁর কবিতা আছে।
মহাদেব আপাদমস্তক কবি,
তাঁকে দেখলেই তা বোঝা যায়,
আমাকে দেখলে যা বোঝা যায় না;
তাঁর কবিতা তাঁরই মতো কবিত্বময়।
মহাদেব প্রেম ও রাজনীতিকে
লিরিকে পরিণত করেছেন,
আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন
সেই কাতরতা,
বিভোরতা,
ভাবাবেগ মধুরতা,
যার থেকে আমরা দূরে স'রে যাচ্ছি।
মহাদেব ও তাঁর কবিতার
দীর্ঘজীবন কামনা করতে
আমি সুখ বোধ করছি।

হুমায়ুন আজাদ
১৫.১১.৯৪

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুবের পতনের অব্যবহিত পরে কবি মহাদেব সাহা পূর্বদেশ পত্রিকায় (১৯৬৯-এর ১৪ আগস্ট) সহকারী সম্পাদকের চাকরি নিয়ে রাজশাহী থেকে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আগমনের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘ বন্ধু-তালিকায় মহাদেবের নাম যুক্ত হয়। খুব ছোটোবেলা থেকেই আমি বন্ধুবেষ্টিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার অজস্র বন্ধু ছিল, — এখনও আমার বন্ধুর তালিকাটি খুবই দীর্ঘ। আমি বন্ধুর লিঙ্গান্তরে বিশ্বাসী নই। সুতরাং বন্ধু বলতে আমি আমার মেয়েবন্ধুদের কথাও বোঝাচ্ছি।

১৯৬৯-এ, যখন ডাকাতি-মামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে হিন্দু-অধ্যুষিত কলকাতায় পালিয়ে না গিয়ে, মুসলমান-অধ্যুষিত ঢাকাকে কাব্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে এই নগরীতে আগমন করি, তখন কবিদের মধ্যে আবুল হাসানকে আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পাই। তাঁর অকাল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবুল হাসানই আমার বন্ধু-তালিকার শীর্ষ আসনটি দাপটের সঙ্গে দখল করে ছিল। আমাদের উন্মূলউদ্বাস্তু যৌথজীবনের গল্প তখন আমাদের কাব্যজগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কবিতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কায়নের প্রশ্নে আবুল হাসানের সঙ্গে আমার ভাবনার বিরোধ থাকলেও, বোহেমিয়ান কবি স্বভাবজাত জীবনবিধ্বংসী প্রবণতার ঐক্যবোধই ছিল আমাদের ঐ বন্ধুত্বের উৎসধার। ধর্ম, সমাজ এবং সর্বোপরি পরিবার অনুমোদন করে না, অন্তর্গত রক্তের টানে আমরা তেমন অসুস্থ শ্রীমতী জয়শ্রী জীবনকেই তীব্রভাবে আলিঙ্গন করেছিলাম। কবিতা ছিল সেই আলিঙ্গনলব্ধ অভিজ্ঞতারই রক্তাক্ত উৎসারণ ও উচ্চারণ ।

কিন্তু মহাদেব? মহাদেব ছিল যৌন-পবিত্রতায় বিশ্বাসী, এমএ পাশ, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাশীল। নিজের তোষক-বালিশ-চাদর, এবং নিজের ঘর না হলে তাঁর ঘুম হতো না। সর্বজনগ্রাহ্য শ্লীলতাবোধের অন্তর্গত নয়, এমন শব্দ বা উপমা সে না উচ্চারণ করেছে মুখে, না ব্যবহার করেছে কবিতায়। প্রকৃতিগতভাবে আমার সঙ্গে মহাদেবের এরকমের মৌলিক পার্থক্য থাকার পরও সে দ্রুতই আমার শীর্ষস্থানীয় বন্ধুতে পারিণত হয়েছিল। কেন হয়েছিল? এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে আমার যা মনে হয়েছে, তা এরকম :

আবুল হাসানের মধ্যে আমি একজন জাত বোহেমিয়ান কবি-বন্ধুর সন্ধান পেয়েছিলাম, যিনি জন্মসূত্রে ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমানদের সম্পর্কে একটা উচ্চমানের ধারণা লাভ করার ক্ষেত্রে ঐ বন্ধুত্ব খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। কবি মহাদেব সাহার মধ্যে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এমন একজন কবিকে আবিষ্কার করি, যিনি অসাম্প্রদায়িক চিত্তের অধিকারী এবং আমার মতই ঢাকাকে ভালোবাসার এবং বসবাসের যোগ্য বলে মনে করেন। ভারতই যে পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী হিন্দুর অনিবার্য গন্তব্য নয়, মহাদেবের মধ্যে আমি এই সত্যের

প্রয়োজনীয় সমর্থন খুঁজে পাই। আমি মহাদেবের মধ্যে এরকম সিদ্ধান্তের সন্ধান পাই যে, তিনি হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে যে দেশ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষতচিহ্নবাহী সেই জন্মভূমিকেও মৃত্যুভূমি হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদের নেতৃত্বে, তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত আছেন। এখানেই আমি মহাদেবের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল খুঁজে পাই। এ-প্রসঙ্গে আমার আরও একজন কবি-বন্ধুর কথা মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন অরুণাভ সরকার।

মহাদেব তাঁর জন্মভূমিকে অন্ধের মতো ভালোবাসেন। তাই এই হতদরিদ্র দেশ ও তার শ্যামল নিসর্গকে তিনি তাঁর কবিতায় বর্ণনা করেন একজন অভিভূত কিশোরের মতো। তাঁর বিস্ময়াবিষ্ট কবিতা আমাদের বাধ্য করে নারীর দিকে ফিরে তাকাতে, শিশুর দিকে ফিরে তাকাতে, নদী-গাছ-পাখি ও ফুলের দিকে ফিরে তাকাতে। পিন আটকে-যাওয়া রেকর্ডের অনুবর্তিত গানের মতোই মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও গভীর অনুরাগের কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করেন।

শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সাম্যবাদিতার প্রতি তাঁর আস্থার মাত্রা এতই প্রখর যে, তিনি কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারলব্ধ পাঁচ সহস্র টাকা মণি সিংহের কমিউনিস্ট পার্টিকে দান করে দেন। এই দানকর্ম নিয়ে মহাদেবকে অনেকসময় আমরা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছি। কিন্তু তারপরও মেনেছি এই সত্যও যে, বিষমিশ্রিত হলেও অমরত্বই মহাদেবের প্রার্থিত। আমি চাই আল্লাহতায়ালা / ভগবান তাঁর সে-প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুদের সৃষ্ট দেবতাদের মতো ক্ষমতাধর হলে, আমিই মহাদেবকে অমরত্বের বর দিতাম।

দেখতে-দেখতে, মনে হয় যেন চোখের পলকে গত হয়ে গেল তাঁর জীবনের পঞ্চাশবসন্ত ; যার অর্ধেকটাই তিনি ব্যয় করেছেন ঢাকা নামক এই রহস্যময়ী নগরীর ধুলো-মাটিতে। এই নগরীর হাসি-কান্নায়। কবির বহুপ্রার্থিত জনপ্রিয়তাও তিনি লাভ করেছেন। তিনি যেমন ভালোবেসেছেন মানুষকে, তেমনি মানুষের ভালোবাসাও তিনি পেয়েছেন। তাঁর বন্ধুভাগ্যও ঈর্ষণীয়। জীবনের নানা-দুর্যোগের সময় আমরা তাঁর বন্ধুদের তাঁর পাশে ছুটে যেতে দেখেছি।

বাংলা কবিতার নির্মম তালিকায় কবি হিসেবে মহাদেবের অবস্থান কোথায়, গত পঁচিশ বছরে তিনি যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং অভিভূত তরুণের মতো (কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে এখানে তাঁর মিল লক্ষণীয়) এখনও অবিরল ধারায় কবিতা রচনা করে চলেছেন — তার মূল্য কতটুকু, তা নিরূপণ করবে মহাকাল। সকল কবিই লুকিয়ে-লুকিয়ে যার দিকে তৃষিত চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন।

নির্মলেন্দু গুণ

কবির পঞ্চাশ

গোলাপের বংশে জন্ম, তুমি শুধু একা হয়ে যাও।

তোমাকে উড়িয়ে নেয় নীলা নীলাঞ্জনা,
আকাশে উড়াল-আঁকা ডালপালা, সবুজ আঁচল,
তোমাকে আগলে রাখে সুধাময়ী বিরাজমোহিনী
ত্বক যার জন্মে-জন্মে তোমার বাকল,
তোমাকে গভীরে টানে ধানঘড়া, গদাধর, পাতালশিকড়,
শস্যের সমরে জয়ী, তীর্থে তীর্থে গড়ে সৌধসাধ ...
মানুষ-বিহঙ্গ তুমি, তুমি কবি, উড়াউড়ি তোমার স্বভাব।

তোমার দেহের মাপে বুড়ো দর্জি আঙরাখা বানিয়েছে আকাশ-রঙের,
তোমার পায়ের নিচে স্বর্ণরেণু এই ধরণীর, এ সংসার ধুলোর সন্ন্যাস;
তোমার মাথার 'পরে নক্ষত্রের ঝাড়বাতি, মুখে বিষ, অমর্ত্য উল্লাস ...
কোথাও ক্রন্দন নেই, তোমার দুচোখে শুধু ফোঁটা-ফোঁটা করুণার চাষ।

সজল তিথিতে জন্ম, শীতে-গ্রীষ্মে ফতুর মানুষ,
কী এমন সময় আর পঞ্চাশ বছর।
বাড়ুক পঞ্চাশ আরো, ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই,
তোমার নিস্তার নেই, অদলবদল নেই,
তুমি শুধু বুকজোড়া তোমার অক্ষর।

যতোটা বদলাতে চাও, ততোটা পারো না,
রোদে পোড়া রোগে খোঁড়া গোলাপ মানুষ;
তোমার বুকের নিচে একা মোমবাতি,
ঘরময় সীতা,
পুত্র তুমি রমণীর, তুমি দুই পুরুষের পিতা ...

অস্ত যায় যদুবংশ, অস্ত শুধু যায় না কবিতা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা
১৫.১১.৯৪